সমকাল

তারিখ ... 27 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও গবেষণা

উন্নয়ন | ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী

অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

শিক্ষা মানুষকে সমাদৃত করে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী করে গড়ে তোলা। তবে এ ক্ষেত্রে স্বশিক্ষাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কেননা, শিক্ষিত হলেই যে একজন মানুষের ভেতরের ভালো ভাবনাগুলো জাগ্রত হবে, সেটাও ঠিক নয়। আবার অশিক্ষিত একজন মানুষের কাছ থেকে আমরা শিক্ষিত একজন মানুষের চেয়েও মেধা ও মননশীল গুণাবলি খুঁজে পেতে পারি। তবে সবক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমকে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রথাগত যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তাতে প্রকৃত সৃজনশীল প্রতিভাধর মানুষ তৈরি হচ্ছে কম। এর মূল কারণ হচ্ছে, মননশীলতা ও উন্নত চিন্তাধারা সৃষ্টির বিষয়টিকে পুরোপুরি অবহেলা করা হয়েছে।

আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য সেটি হলো– শিক্ষা যে গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে সে ধরনের মনোভাব এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে খুব একটা বেশি দেখা যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে গবেষণার প্রতি এক ধরনের অনাগ্রহতা ও পশ্চাদমুখিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের দেশে বর্তমানে খাদ্য, লৌহ ও বস্ত্রশিল্পের প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়ছে। আবার এই শিল্পগুলোকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে 'প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল'– এই ধারণাটিকে অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল হলো– কোনো একটি পণ্য প্রথমে নতুন পণ্য হিসেবে বাজারে আসে, এরপর এই পণ্যের প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে দেশি ও বিদেশি বাজারে পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। এক সময় এই চাহিদা একটি স্থিতিশীল অবস্থায় এসে পৌছায়। এই সময়ে যদি গবেষণার বিষয়টিকে ভাবা না হয়, তবে পণ্যের চাহিদা ক্রমশ কমে যেতে থাকে। এ জন্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন শিল্প কারখানায় রিচার্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। আমাদের দেশে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করা হলেও মুনাফাভোগী মালিকরা এই ব্যয় বহন করতে চায় না বলে তা এক সময় বন্ধ হয়ে যায়।

আর যখন এই প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই পণ্যের চাহিদা বাজারে আর থাকে না। এর কারণ হচ্ছে, গোটা বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ফলে এ ধরনের শিল্প কারখানাগুলো বিদেশে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে তাদের বাজারে প্রচলিত পণ্যগুলোর গুণগত মান কীভাবে সমৃদ্ধ করা যায় অথবা অন্য কোনো ধরনের নতুন পণ্য উৎপাদন করা যায় কি-না এ বিষয়ে গবেষণার কাজটি চালিয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই শিল্প কারখানাগুলোর সুদূর প্রসারী কোনো পরিকল্পনা না থাকায় তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বিশ্ববাজার থেকে ছিটকে পড়ে। যা কোনোভাবেই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কাম্য নয়। অমর্ত্য সেনের দেশের কল্যাণের জন্য অর্থনীতি এ ধারণার সঙ্গেও বিষয়টির সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো, বিদেশের শিল্প কারখানাগুলোর সঙ্গে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও আমাদের দেশে এ ধরনের সংস্কৃতি এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এ ধরনের সংস্কৃতি যদি আমাদের দেশে প্রচলিত থাকত, তবে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প কারখানা উভয়ই এর সুফল ভোগ করতে পারত। এ বিষয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা শিল্প কারখানার মালিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণার ক্ষেত্রে যে সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার, তা তারা এক ধরনের অপব্যয় হিসেবে চিন্তা করে। ফলে একমাত্র সরকারই আইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প কারখানার মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধ তৈরি করতে পারে। আর এ ধরনের সম্পর্ক যদি গড়ে তোলা যায়, তবে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের যে ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তা ত্বরান্বিত হবে। এ সম্পর্ক যদি সফলতায় রূপ নেয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিল্প কারখানা হতে গবেষণার বিষয়বস্তুসহ এর আর্থিক বিষয়ে নিশ্চয়তা পাবে। অন্যদিকে শিল্প কারখানাগুলো নতুন ধরনের পণ্য ও প্রচলিত পণ্যের উৎকর্ষতা সাধনের ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী সুফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে ধারণা পাবে।

গবেষণার প্রতি এক ধরনের অনাগ্রহতা ও পশ্চাদমুখিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের দেশে বর্তমানে খাদ্য, লৌহ ও বস্ত্রশিল্পের প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়ছে। আবার এই শিল্পগুলোকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে 'প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল'– এই ধারণাটিকে অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন শিল্প কারখানায় রিচার্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। আমাদের দেশে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করা হলেও মুনাফাভোগী মালিকরা এই ব্যয় বহন করতে চায় না বলে তা এক সময় বন্ধ হয়ে যায়

আমরা সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেও বাস্তবে তা কতটা কার্যকরী হচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের কোনো ধরনের গবেষণা নেই। ফলে লেখাপড়ার চাপে পড়ে একজন শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবইয়ের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছে। পাঠ্যবইয়ের বাইরেও যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আরও উপাদান রয়েছে তা তার অগোচরেই থেকে যাচ্ছে। ফলে তার মধ্যে কল্পনাশক্তির বিষয়টি গৌণ হয়ে যাচ্ছে। আর যখন কল্পনাশক্তি তৈরি হচ্ছে না, তখন প্রকৃত সৃজনশীল মানুষ তৈরির বিষয়টি মুখ্য না হয়ে গৌণ হয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত ও উদার চিন্তাধারা না থাকায় এক ধরনের রোবটতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রোবটকে যেমন রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তেমনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত একজন শিক্ষার্থীকেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষার্থীর প্রকৃত ও নিজস্ব কল্পনা এবং চিন্তাশক্তি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকশিত হচ্ছে না।

পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা শিক্ষা ব্যবস্থার দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ড পরিচিতি লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিনল্যান্ড জার্মানদের মিত্র শক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিখ্যাত লেনিনগ্রাড যুদ্ধে জার্মানির মিত্র শক্তি হিসেবে ৬০ হাজার ফিনিশ সৈন্য অংশগ্রহণ করে। এ সময় এ দেশটির অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে পড়ে। কিন্তু আজ এ দেশটিই বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে একটি। নকিয়ার মতো টেক জায়ান্টের জন্ম এখানেই। প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্টের (পিআইএসএ) মূল্যায়ন পদ্ধতিতে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমেরিকার মতো পরাশক্তির শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে না দেখে শিক্ষার্থীদের মননশীলতা তৈরির মাধ্যমে প্রতিভা বিকাশের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, রিডিং, গণিত ও বিজ্ঞানে ফিনিশ শিক্ষার্থীরাই পৃথিবীর সেরা। এর পরের অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর ও জাপান। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয় অনেকদিন ধরেই আলোচিত হচ্ছে। ২০১০ সালে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। তবে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় যে শুভ উদ্যোগ নিয়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থার চিন্তা করা হয়েছিল, তা পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারেনি। যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের বিষয়টি উঠে আসছে। এ জন্য একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প কিছু নেই বলে ধারণা করা যায়। যদিও এই শিক্ষা নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, তা অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করেনি। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মহীনতাকে বোঝায় না। বরং সবাইকে সব ধর্ম সম্পর্কে পড়তে হবে– এ বিষয়টিকেই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কারণ একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি বিজ্ঞানসম্মত একই ধারার সমাজ তৈরি করা না যায়, তবে তা ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন ধারার মানসিকতা তৈরি হবে। ফলে একদিকে শ্রেণিবৈষম্য আর অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা আগামী বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অনৈক্যের অশনিসংকেত হতে পারে, যা দেশ ও জাতির জন্য কখনোই কল্যাণ বয়ে আনবে না।